জাগৃতি

বাৎসরিক পত্রিকা

সম্পাদক

ড. রামকৃষ্ণ মণ্ডল

সহ-সম্পাদক

সোমনাথ মণ্ডল

জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয়

জাগৃতি

পত্রিকার আত্মপ্রকাশ : ৮ই এপ্রিল, ২০২৩

সম্পাদক
ড. রামকৃষ্ণ মণ্ডল
সহ-সম্পাদক
সোমনাথ মণ্ডল

উপদেষ্টা মণ্ডলী
ড. চিরঞ্জীব মুখার্জি, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
সুকন্যা পাল, বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি বিভাগ
সতাপ হালদার, বিভাগীয় প্রধান, দর্শন বিভাগ
নারায়ণ সামন্ত, বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
টিনা বসু, বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ
শুভজিৎ সাহা, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ
অমিত কুমার পন্ডিত, বিভাগীয় প্রধান, ভূগোল বিভাগ
ইমান আলী মোল্লা, বিভাগীয় প্রধান, আরবি বিভাগ

মুদ্রণ
অনন্যা প্রিন্টিং ওয়ার্কার্স
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ১৫০ টাকা

শুভেচ্ছা পত্র

জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয়-এর পক্ষ থেকে বাৎসরিক পত্রিকা হিসাবে 'জাগৃতি'-র আত্মপ্রকাশ প্রশংসাযোগ্য। ২০০৭ সালে গুটিকয়েক ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের মাধ্যমে এই কলেজের পথ চলা শুরু। কলেজ স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ, কলেজের বিল্ডিং নির্মাণ, সরকারি অনুমোদন প্রাপ্তি ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মে এই এলাকার বহু শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অবদান জড়িয়ে আছে। তাদের সেই মহতী প্রচেষ্টাতে আজ জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয়, তার যোগ্য ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনে বদ্ধপরিকর। ছাত্রছাত্রীরাও পড়াশোনার পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চাতেও আগ্রহী হচ্ছে। বিগত কয়েক বছর ধরে 'নতুন পাতা' নামের দেওয়াল পত্রিকাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্যচর্চার যে প্রতিফলন ঘটে আসছিল, এ পত্রিকা তারই বড় সংস্করণ। কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী বন্ধুগণের সহযোগিতায় মূলত ছাত্র-ছাত্রীরাই তাদের সাধ্যমত বিভিন্ন ধরনের লেখালিখি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যোগান দিয়েছে এই পত্রিকার জন্য। ''ঘুমিয়ে থাকে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে''—আজ যারা ছাত্র-ছাত্রী, আগামীতে তারা ভাবি কালের নাগরিক। তাই তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য কলেজের পক্ষ থেকে এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শুভেচ্ছান্তে
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
ড. রামকৃষ্ণ মন্ডল
০১/০৪/২০২৩

সূচী

সম্পাদকীয় ৭

■ কবিতা

গুরু
ড. চিরঞ্জীব মুখার্জী ৯

জীবনবোধ
সরিফুল ইসলাম সরদার ৯

জিজ্ঞাসা
রবীন কুমার অধিকারী ১০

কলকাতা শহর
তুহিনা জাসমিন তরফদার ১০

বসুন্ধারা
মনিরুল গাজী ১১

বদলে গেছি আমি
তামিম সাঈদ ১১

এক নারী
কিশোর সাহা ১২

নায়কের ভাব
শাহাজাহান লস্কর ১৩

বেগম রোকেয়া
রুবাইয়া সুলতানা ১৪

স্বপ্ন দেখি আমি
তামিম সাঈদ ১৪

বিদ্যা
অরমিনা খাতুন ১৫

চেতনা
সাবানা খাতুন ১৫

■ ছোটগল্প

পিশাচ
রামকৃষ্ণ মণ্ডল ১৬

বৃদ্ধ বাবার শেষ ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম
তুহিনা জাসমিন তরফদার ১৭

■ প্রবন্ধ

মা
তুহিনা জাসমিন তরফদার ১৮

প্রশ্ন...
কিশোর সাহা ১৯

কঠোর পরিশ্রমী তরুন
মোস্তাফিজুল সেখ ২০

নির্বাচনী বন্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন
শাহাজাহান লস্কর ২১

বেগম রোকেয়া
আয়েষা খাতুন ২২

ধর্মের আঁচড়ে বাস্তব
আরমান মোল্লা ২৪

প্রিয় অতীত
আরমান মোল্লা ২৮

বাংলার উৎসব
কারিনা সেখ ৩১

সম্পাদকের কলমে

যেকোনো গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও সূচনার পিছনে কিছু না কিছু ইহিতাস ধরনের বিষয় থাকে। জাগৃতি'-র আত্মপ্রকাশের পিছনে সেরকম কিছু না থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য প্রতিভা বিকাশের সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল। মহাবিদ্যালয়ের 'সাংস্কৃতিক সমিতি'র উৎসাহ ও ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগেই মূলত এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ।

পত্রিকার নামকরণ সম্পর্কে কাটাছেঁড়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত 'জাগৃতি' নামটাই নির্দিষ্ট হলো। জাগৃতি জেগে ওঠারই নামান্তর। প্রাণিজগতের সবাই চিরকাল ঘুমিয়ে থাকেনা, তবে মানুষের জেগে থাকার সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীদের না ঘুমিয়ে থাকার পার্থক্য রয়েছে। আমরা মননশীল, আর সেই মননশীলতার উন্মেষ ঘটানোর পিছনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দায়বদ্ধতা রয়েছে। সেই নৈতিক কর্তব্য পালনের জন্যেই মূলত এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। যার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মৌলিক সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটানো রূপকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

'করোনা' কালে আমরা অনেক শিক্ষা পেয়েছি। তার অভিঘাত মানব সমাজের আর্থ-সামাজিক দিক্‌কে যেমন বিধ্বস্ত করেছে, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা ও মৌলিক চিন্তাভাবনার জগতকেও তেমনি অনেকাংশে বিনষ্ট করেছে। তবুও আমরা কেউ হাল ছাড়েনি। শুধু পড়াশোনা নয়, তার পাশে তার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার স্বপ্ন দেখে। তাদের সেই স্বপ্নকে সার্থক করার লক্ষ্যে এই পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা।

এই পত্রিকা যারা লিখেছে তারা প্রায় সকলেই বিভিন্ন সেমিস্টারে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী। শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহের তাগিদে দুই এক'জন অধ্যাপকও তাঁদের লেখা দিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন রূপরীতি সম্পর্কে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরাই অসচেতন বা উদাসীন। তাই এই সংখ্যার বিভিন্ন ধরনের লেখার গুণগত মান সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদাসীন থাকতে হয়েছে। আগামী দিনে এই পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুণগত মান যাতে বর্ধিত করা যায় সেদিকেও আমাদের লক্ষ্য থাকবে।

রামকৃষ্ণ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয়

গুরু

ড. চিরঞ্জীব মুখার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জীবন তলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয়

একলব্য কাটছে আঙুল
দ্রোণাচার্য দক্ষিণা চান।
তিনি রাজকূলের গুরু
তিনি বড় সুমহান।
নিষাদ বলে দেননি শিক্ষা
তবুও তাঁর দক্ষিণা চাই।
এমন গুরু ভূ-ভারতে আর
ছিলেন কিনা জানা নাই।
অর্জুন তাঁর প্রিয় শিষ্য
তাঁকেই প্রমোট করতে চান।
একলব্যের একাগ্রতা তার
প্রতিভাকে করল প্রমান।

দ্রৌপদীর খুলছে শাড়ি
রাজ দরবারের সবাই চুপ।
রাজারা সব এমনই হন।
শিক্ষকেরও সমান রূপ।
কর্ণকেও রাজ দরবারে
করলেন দ্রোণ অসম্মান।
কোন সমাজে এমনতর
বর্ণভেদী শিক্ষক চান?
শিক্ষক হোক সমদর্শী
শিক্ষা হোক সবার।
শিক্ষা নিয়ে রাজনীতিটা
বন্ধ হোক এবার।

জীবনবোধ

সরিফুল ইসলাম সরদার
বড়বাবু, জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয়

জীবনের অন্তহীন পথে চলতে চলতে আমরা ক্লান্ত।
তবুও থেমে থাকি না কেউ,
এগিয়ে চলার নামই তো জীবন।
জীবনের নিগূঢ় মাহাত্ম্য কোথায়?
জীবন পথের বাঁকে ঘুরপাক খেতে খেতে
কখনো থমকে দাঁড়াই,
যোগ-বিয়োগের হিসেব কশি।
হাতড়ে বেড়াই পথের সমাপ্তি।

কখনো মনে হয় সব ছেড়ে চলে যাই...
কিন্তু কর্তব্যের বন্ধন অস্বীকার করব কি করে?
ছেড়ে যাব বলা সহজ কিন্তু সহজ তো নয় মোটে।
যাদের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলাম নির্দ্বিধায়,
তাদেরকে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য
আমার লড়াই চলবে।

মাঝে মাঝে মাথার মধ্যে কেমন যেন সব
উল্টোপাল্টা চিন্তার ঘূর্ণিঝড় ঘুরপাক খায়।
বস্তা পচা সমাজ ব্যবস্থার মানুষ হয়ে
মত ও চলার পথের দ্বন্দ্বে হতভম্ব হই।
রক্তের মধ্যে নেশা ধরায়, বিচলিত করে মন।
কিন্তু বলতে পারি না কিছুই।

তবে কি বোবা হয়ে থাকার নামই জীবন?
না মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রাণপাত করাটাই জীবন?
সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে বারবার বিচলিত হয় মন।
অবশেষে ক্লান্তহীন নাবিকের মতো
আবার বুক বাঁধি যাদের সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িয়ে নিয়েছি,
কেন তাদের অবহেলা করব?

জিজ্ঞাসা

রবীন কুমার অধিকারী
সংস্কৃত বিভাগ

যদি ত্বং জীবিতুমিচ্ছসি কিং কর্তব্যম্?
-তর্হি জীবনেন সহ সংঘর্ষ কুরু।
যদি ত্বং ত্যঞ্চুমিচ্ছসি কিং কর্তব্যম্?
-তর্হি ত্যজ দুর্গনম।
যদি ত্বং বক্তুমিচ্ছসি কিং কর্তব্যম্?
-তর্হি যত্যম বদ।
যদি ত্বং কিমপি গ্রহীতুমিচ্ছসি?
-তর্হি আশীর্বাদং গৃহণাতু।
যদি ত্বং কিমপি দাতুমিচ্ছসি?
-তর্হি জ্ঞান দানং কুরু।
যদি ত্বং কিমপি কর্তুমিচ্ছসি?
-তর্হি উদ্যমং কুরু।

কলকাতা শহর

তুহিনা জাসমিন তরফদার
১ম বর্ষ

কলকাতার ওই নামের সাজে
ভিন্ন ভিন্ন লোকের মাঝে,
গা ঠেলা ঠেলি পা ঠেলা ঠেলি
নাইকো একটি গাছের সারি।
দম যে আসে বন্ধ হয়ে
চারিদিকের ওই বিল্ডিংয়ের মাঝে।
ঝম-ঝম-ঝম রেলের শব্দে
কানের পর্দা ফাটিয়ে তোলে।
কতইনা দরিদ্র শুয়ে আছে,
ফুটপাতের ওই কম্বলের মাঝে।
জানেন তারা ওখানে কেন?
টাকার জন্য, পেটের দায়ে
সারাদিন ঘাম ছুটিয়ে পাবে ক'টি টাকা
তাতেই আনন্দ কারণ তারা দরিদ্র।
সন্তানেরা আশা নিয়ে বসে আছে
ফিরবে কবে টাকা নিয়ে।
মরেনি তারা বেঁচে আছে,
জল আর শুকনো রুটি খেয়ে।

বসুন্ধরা

মনিরুল গাজী
ইতিহাস (অনার্স), ৬ষ্ঠ সেমিস্টার
রোল-৮৭৯

কত সুন্দর আমাদের এই বসুন্ধরা,
মায়াতে তার অন্তর ভরা।
রবির বিকিরন দিনের বেলা,
রাতে চন্দ্র তারা আসমান ভরা।
—ছেড়ে যেতে চাই?
কত সুন্দর আমাদের এই বসুন্ধরা!
চারিদিকে মায়ার সবুজে ঘেরা
শস্য-শ্যামলা, বৃক্ষ ত্রিফলা,
আর মন ছুঁয়ে যাওয়া একরাশ নিলিমা!
আষাঢ়ের ভেজা যেন মন ভালো করা!
—কেন এত মায়া?
কত সুন্দর আমাদের এই বসুন্ধরা!
শন শন বাতাস বয়ে যায়
যেন মাটির সহিষ্ণুতা মাখিয়ে দেয়!
পাখির কলতান শুনে কেটে যায় বেলা
নানান পুষ্প ফলে ভরা!
—সত্যি কি তাই?
কত সুন্দর আমাদের এই বসুন্ধরা।

কত লাঞ্ছনা কত বঞ্চনা
সইতে হয় দুবেলা!
আর কত সইবো এ যন্ত্রনা
জানি ছাড়তে হবে একদিন এ মায়াকে
তবে কেন ঈশ্বর পঠিয়েছিল এ ধরাতে?
—হায়রে মায়ার দুনিয়া!

বদলে গেছি আমি

তামিম সাঈদ
২য় বর্ষ, ৪ সেমিস্টার

একটা সময় তোকে ভেবেই
করেছি লেখালেখি
মনের ঘরে আজ নিজেকে
বদলে যেতে দেখি।

বদলে গেছি-বদলে যাবো
করছি অনশন,
তোর যা খুশি আমায় নিয়ে
করিস প্রহসন।

আবার যদি মুখোমুখি
হয় দু'জনার দেখা,
বলে দিতাম, তোকে ছাড়া-
আর লাগে না একা।

হয় তো আবার দেখা হবে
বিশ্বটা যে গোল
ভুল করেও তোর হৃদয়ে আর
দেবো না সেই দোল।

এখন আমার সঙ্গী আকাশ
জোছনা ধোয়া রাত
লাভ হবে না আর বাড়ালে
ভালোবাসার হাত।

এক নারী

কিশোর সাহা
৬ষ্ঠ সেমিস্টার

সে দুষ্টের চোখে চোখ রেখে বলেছিল তুই অপরাধী
তুই কেড়ে নিয়েছিস আমার সন্তান, আমার স্বামী, আমার
আশা-ভরসা, আমার যত্নে রাখা শেষ সম্বলটুকু।
পরিবর্তে ফিরে পেয়েছি বুক ভরা যন্ত্রণা, কন্যার
বীভৎস ছিন্নভিন্ন শরীর, স্বামীর রক্তাক্ত দেহ।
বিশ্বাসের পরিবর্তে পেয়েছি একবুক হতাশা।

সে যুদ্ধ ছিল তোমার আমার
আমি বিশ্বাস রেখে পরাজিত
প্রিয়জন হারাবার শোকে
তুমি বিজয়ী ভীতু বিশ্বাসঘাতক রূপে।

আমি আবার যুদ্ধ ঘোষণা করছি.....
লড়াই করো আমার সঙ্গে
আমি ভারত মায়ের বীর কন্যা,
আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না।
যুদ্ধ আমার ধর্ম, যুদ্ধ আমার রক্তে, আমি যোদ্ধা।

তবে শুরু হোক যুদ্ধের প্রস্তুতি.....
সেজে উঠলো। সে সেজে উঠলো রণ সাজে
ঢাল তরোয়াল অস্ত্র-শস্ত্রের সাজে।
বুকে পরে নিল লোহার বর্ম, একহাতে ঢাল, অপর হাতে অস্ত্র
সে নারী যেন জগৎ ধাত্রী, চণ্ডালীনী মা।
অসুর নাশিনী দশভূজা দূর্গা।
তার শরীরে সেই লোহার বর্ম হয়ে শোভা পায় শিক্ষা,
ঢাল হয়ে তার হাতে শোভা পাচ্ছে ‘ধৈর্য’, ‘আত্মবিশ্বাস’।
ডানহাতে অস্ত্র হয়ে শোভা পাচ্ছে ‘সৎ-সাহস’, ‘অন্যের
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ’।

তার দুটি চোখ যেন অগ্নিদৃষ্টিতে গর্জে উঠে বলে.....
কোথায়! কোথায় আছে সেই অদৃষ্ট?
কোথায় সেই অত্যাচারী দানবরুপি পুরুষ?
কোথায় সে! কোথায়?
সে যেন বধ করতে চায় সেই অদৃষ্টকে।
সে যেন স্বাধীনতা চায়, মুক্তি চায়।
নারীজাতি যে আজো পরাধীন
সে পরাধীনতা আমাদের লজ্জা, সে পরাধীনতা আমাদের ব্যর্থতা।

নায়কের ভাব

শাহাজাহান লস্কর
পলিটিক্যাল সায়েন্স, ৬ষ্ঠ সেমিস্টার
রোল: ৯০৪

ভারতের রাজনীতি একটি দিগন্তের চাঁদনী আলো,
বিশ্বাসের গানে বিকাল চলে যায় বিপুল ভালো।
তারকা অধিকারে ঝুলে নায়করা,
প্রতিশোধে নিয়ত হয় জনগণ ফালা ফালা।
পথে পথে চলে অনেক কথা তাদের সম্পর্কে,
আশা বিরাট, প্রশ্ন অসম্ভব, মত বিভ্রান্ত হয়ে।
তবু সত্যের আলোয় সব অন্ধকার ভেঙে,
বিপনন করা জনগণের দ্বারা আবার প্রতিষ্ঠিত হয়।
ভারতের রাজনীতি একটি দিগন্তের চাঁদনী আলো,
বিশ্বাসের গানে বিকাল চলে যায় বিপুল ভালো।

বেগম রোকেয়া

রুবাইয়া সুলতানা
পলিটিক্যাল সায়েন্স, ৩য় বর্ষ
৬ষ্ঠ সেমিস্টার

বাংলার ঘরে জন্ম নিলে তুমি
দেখাতে এই আশা,
আঁধারে জ্বালিয়ে আলো
দেখিয়েছো জ্ঞানের দিশা।

প্রতিবাদী হও জেগে ওঠো
সমগ্র বাংলার নারী।
তোমাদের মাঝে জ্ঞানের আলো
ফুটিয়েছে এক মহীয়সী নারী।

রোকেয়া তোমার সাথে
হয়না কারোর তুলনা।
রূপে, গুণে, বুদ্ধিতে তুমি
সর্ব জ্ঞানী ললনা।

প্রদীপের শিখার মত
জ্বলে ওঠো বাংলার নারী।
বাংলার ঘরে ঘরে হয়ে উঠুক
রোকেয়ার মত বিপ্লবী নারী।

স্বপ্ন দেখি আমি

তামিম সাঈদ
২য় বছর, ৪র্থ সেমিস্টার

ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখি কোত্থেকে এক জীন
হঠাৎ এসে চমকে দিয়ে বাজায় সুরের বীণ।
জীনের দেহে সাদা কাপড় পুরো শরীর ঢাকা,
একটুখানি দেখব ছুঁয়ে নাই রে কোথাও ফাঁকা!
করুণ স্বরে কাঁদছে জীনে বললো কাছে এসে,
তুমি আমার সঙ্গী হবে দূর পাহাড়ের দেশে?
শুনেই পিলে চমকে গেলো উঠলো কেঁপে হিয়া,
জীনের সাথে দূরের দেশে কী আর হবে গিয়া?
কিন্তু নাছোড় জীনবাবাজী আমায় করে কাবু,
মন্ত্রবলে দেয় বানিয়ে ছোট্ট সোনাবাবু।
পিঠের ওপর নেয় বসিয়ে শক্ত করে ধরে,
ঘাড় ঘুরাতেই পড়ছি ধপাস্ স্বপ্ন ভাঙার ঝড়ে.....

বিদ্যা

অরমিনা খাতুন
ইতিহাস (অনার্স), ৩-য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সেমিস্টার
কলেজ রোল নং-২০২১৯০২

বিদ্যা সবার অলংকার,
সবাই যত্ন করো তার।
গ্রন্থ পড়ো দিবা-রাতি,
জীবন হবে জ্ঞানের বাতি।
মন দিয়ে বই পড়ো—
জীবনটাকে ভালো করে গড়ো।
বিদ্যা হল এগিয়ে যাওয়ার গতি—
না পড়লে তোমার হবে ক্ষতি
বিদ্যায় আছে এক অলৌকিক শক্তি,
অর্জন করলে 'পরে অজ্ঞতা থেকে দেয় যে মুক্তি।
যতই করবে 'বিদ্যা-দান',
ততই বাড়বে তোমার মান।
বিদ্যা সবার অলংকার,
সবাই যত্ন করো তার।

চেতনা

সাবানা খাতুন
ষষ্ঠ সেমিস্টার, বাংলা অনার্স

আমার চেতনায়
ভাবনা আসে
খামখেয়ালির সুরে,
আমার চেতনায়
স্বপ্ন আসে
তপ্ত হৃদয় জুড়ে।
আমার চেতনায়
হতাশা আসে
কাল রাত্রির ভোরে,
আমার চেতনায়
ইচ্ছা আসে
একেলা অবসরে।
আমার চেতনায়
অভিমান অসে
অবহেলার ঝড়ে,
আমার চেতনায়
কল্পনা আসে,
মেঘলা বাতাসে
উড়ে।
আমার চেতনায় ভালবাসা আসে
আসক্তির কম্পনে,
আমার চেতনায়
মরণ আসে
শেষ দিনের স্পন্দনে।

পিশাচ

রামকৃষ্ণ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয়

বসন্তের গা থেকে তখনো মৃদু-মন্দ বাতাসের লেশটুকু মুছে যায়নি। প্রভাত সূর্যের রাঙা আলোয় গাছের সবুজ পাতাগুলি সারাদিনের তাপপ্রবাহে আপন আপন অস্তিত্ব বজায় রাখার সংকল্পে নিস্তব্ধ। নাগরিক জীবনের কোলাহল মুখর জীবনযাত্রার উষ্ণতম ইশারায় রাস্তার যানবাহন গুলিও চালকদের অনুশাসনে ব্যতিব্যস্ত। কোকিলের কুহুতান মাঝে মাঝে জানান দিচ্ছিল-বসন্ত এসেছিল, আবার বিদায় নিতে চলেছে।

লালটু। নগরের অলি-গলিতে ঝর ঝরে সাইকেলে, জ্যান্ত রুই, কাতলা ফেরি করে বেড়ায়। গ্রামে বাপ-মা থাকে। জীবিকার তাগিদে শহরে আসা। টিনের চালের ভাড়া ঘরে স্বামী-স্ত্রীর সংসার। নিকষ কালো রং এবং বেটে খাটো চেহারা। নিরেট নিটোল ফুট পাঁচেকের এই কিশোর সেই কাকভোর থেকে, 'মাছ চাই' মাছ চাই, বলে চিল চিৎকার করে বেড়ায়। খুব সরল সাধারণ। ব্যবসায় নতুন নেমেছে। নগরের কেউ কেউ পছন্দসই মাছ কেনে তার হাঁড়ি থেকে। উচিত মূল্যের মাছ বিক্রি করতে পারলে তার কচি কালো চাপ দাড়িতে, ঢেকে থাকা দাঁতের পাটি দুটির উপরিভাগ মৃদু উঁকি মারে। এক চিলতে নিষ্পাপ হাসি হেসে, আবার পরের দিন আসার আশ্বাস দিয়ে সাইকেলে পা রেখে এগিয়ে যায় অন্য দ্বারে।

সেদিন বৃহস্পতিবার। গুরুবার। প্রত্যেকদিনের মত রুই-কাতলার আনাগোনা তার এ্যালমুনিয়ামের সাদা বড় হাঁড়িতে। জীর্ণ সাইকেলের হাতল ধরে খরিদ্দার প্রত্যাশী লালটু একটি আবাসনের নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। চেনা সুরে ডাকা-ডাকি, হাঁকা-হাঁকি। কাকু মাছ চাই, স্যার মাছ দেবো নাকি ইত্যাদি। মিনিট দুয়েকের অপেক্ষা। আবাসনের নীচতলা থেকে একটি বজ্র বেশি, সাদাচুলো বয়স্ক লোকের আবির্ভাব। সাদা লোমে আবৃত পাকানো শরীরে বয়সের ছাপ। পাকা চুলে, দেহমনে যৌবন্যের তারুণ্য। কোমরের খাঁজে শক্ত গিটের আগলে লুঙ্গি ঝুলছে।

আবাসনের এই মানুষটির সম্পর্কে নানান ধরনের জনশ্রুতি আশেপাশের বাতাসে মিশে আছে। কেউ বলে লোকটি একেবারে নিরেট স্ত্রৈণ। পাশের বাড়ির ফিচেল বৌদি তো একদিন বলেই ফেললেন, ''ওই আবাসনের নীচের তলার কাকু পোষমানা মেনি বেড়ালের মতো, কাকিমার আঁচলে লালিত।'' গলির প্রান্তে যে ববকা'দা মুদি - মনোহর নিয়ে খরিদ্দারের অপেক্ষায় আড়ি পেতে রয়েছে, সে তো ভদ্রলোক'কে দুমুখো সাপ বলেই চেনে। তবে, যাঁর সম্পর্কে এ কথাগুলো হচ্ছে সেই মানুষটি কিন্তু যথেষ্ট ঘোড়েল। শিক্ষকতার দ্বারাই নাকি তাঁর কর্ম জীবন সম্পন্ন হয়েছে। অতএব তিনি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তবে তাঁর শিক্ষকের পোশাকে বেমালুম গায়েব করার জনশ্রুতিও নিন্দুকপ্রিয় পরিচিত মহলে ফিশফিশ শব্দে শোনা যায় কখনো কখনো। বর্ণচোরা নিন্দুক গোত্রভুক্ত তাঁর ঐ হাড়গিলে জামাই একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্বশুরের কর্মজীবন সম্পর্কে একটা নিদারুণ খোঁচা মেরেছিল। তাতেই ''হাটে হাঁড়ি ভাঙে''। জামাই বাবাজির শ্বশুর সম্পর্কে এই প্রলাপের সূত্রে আবাসনের অধিকাংশ বুঝেছিল, ভদ্রলোক কোন একটি নামকার স্কুলের কেরানির দায়িত্বই সামলেছেন।

সেই প্রভাত সূর্যের মোলায়েম উত্তাপটুকু লোমোশ দেহে ধারণ করে ভদ্রলোক লালটুর সঙ্গে মাছের দর-দাম নিয়ে একচোট লড়াই করলেন। অতঃপর শ' আস্টেকের একটি রুই মাছ। ঐতিহ্য মেনে খরিদ্দারের আবদার মত ধারালো বটিতে লালটুর মৎস্য ছেদনে পেশাদারী সংযোগ। সঙ্গে তিন তলার গহন স্যারের সঙ্গে কথোপকথন।

এদিকে অপলক দৃষ্টিতে সেই লোমোশদেহী অপেক্ষমান। অক্ষিদ্বয় তাঁর নিবদ্ধ লালটুর ধারালো বটিতে। চক-চক, চকাস। ৮০০ গ্রাম রুই মাছ ফালাফালা। কয়েক টুকরোর রিং পিস্। শুরু হলো লোমোশ যুক্ত বয়স্ক ভদ্রলোকের খেল - ''তোকে বললাম মাছ'টার পেটি বার করতে, আর তুই কিনা ওরকম গোল গোল করে কাটলি, যা তোর মাছ তুই খা। আমি নেব না।" মুহূর্তকাল দেরি না করে অগ্নিশর্মা গৃহস্বামী সটান অন্দর মহলে।

নিরুপায় বেচারা মাছওয়ালা লালটু। করুন ছল ছলে তার দুচোখ। কুটিল পৃথিবীর জটিল নাগরিক সমাজের কুটিল মনের খবর খুব বেশি তার পক্ষে জানবার অবসর ছিল না। কালো রঙের একটি কালো প্যাকেটে কাটা মাছের টুকরো গুলো তুলে নেয়। প্যাকেট বন্দি মাছগুলো নাইলন ব্যাগে সাইকেলের ডান দিকের হ্যান্ডেলে দেদুল্যমান। লালটুর ডান হাতেও সেই একই দিকে। অন্য হাতের বাহুবন্ধে ময়লা গেঞ্জির আঁচল, স্বভাবজ ভঙ্গিতে স্পর্শ করেছে তার চোখের চিকচিকে অশ্রুকে। সাইকেল সহ মাছের অ্যালুমিনিয়াম হাঁড়ি ধক ধক করতে করতে আবার এগিয়ে চলল সামনের দিকে। খরিদ্দার খোঁজার জন্য।

বৃদ্ধ বাবার শেষ ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম

তুহিনা জাসমিন তরফদার
বি.এ. ১-ম সেমিস্টার

ছেলে তার বাবাকে অনাথ আশ্রমে রেখে আসতে গেল। সঙ্গে বাবার জামাকাপড় এবং জরুরি সব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল ব্যাগ ভরে। ছেলে আশ্রমের ম্যানেজারের সঙ্গে সমস্ত কথাবার্তা সেরে তার বাবাকে সেখানে রেখে সে চলে যাচ্ছিল। সে আশ্রমের বাইরে বেরোবে তখনই তার ফোন বেজে উঠল। ফোনটা তার স্ত্রীর ছিল, সে ফোনে বলছিল—''ফিরে আসার আগে তোমার বাবাকে বলে দিও কোন ছুটি বা কোন উৎসবে আমাদের সাথে দেখা করতে না আসলেও চলবে। আপনি ওখানে খুশিতে থাকেন আর আমাদের এখানে খুশিতে বাঁচতে দিন।" ফোন রেখে ছেলে আবার অনাথ আশ্রমের দিকে ফিরে যাচ্ছিল। ছেলের নজর তখন তার বৃদ্ধ বাবার দিকে পড়েছিল। সে দেখছিল, তার বাবা সেই আশ্রমের ম্যানেজারের সাথে হেসে হেসে কথা বলছিল, আর তাকে দেখে খুশি খুশি মনে হচ্ছিল। এটা দেখে তার ছেলে খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল, বাবা আশ্রমের ম্যানেজারকে কীভাবে চেনেন? কিছুক্ষণ পর যখন তার বাবা ম্যানেজারের থেকে দূরে চলে যান, তখন সে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে তার বাবাকে কীভাবে আর কবে থেকে চেনেন। ম্যানেজার তাকে জানান তোমার বাবাকে আমি তখন থেকে চিনি যখন তিনি অনেক বছর আগে একটি অনাথ বাচ্চাকে আমার আশ্রম থেকে দত্তক নিতে এসেছিল।

এখন প্রশ্ন হল আসলে অনাথ কে ছিলো? সেই ছেলে তার বাবার এত বড় উপকারের বদলে তাকে শেষ বয়সে এভাবে ছেড়ে দিল। নাকি সেই বাবা যে একটি অনাথ বাচ্চাকে তার নিজের ছেলের মতো করে ভালোবাসা দিল তাকে লালন পালন করলো।

মা

তুহিনা জাসমিন তরফদার
১-ম সেমিস্টার

মা এখন অংক বোঝেনা: একটা রুটি চাইলে দুটো এনে দেয়। কোথাও যাওয়ার সময় ২০ টাকা চাইলে ৫০ টাকা এনে হাতে গুজে দেয়।

মা এখন ইংরাজী জানেনা: "I hate you" বললে উল্টে না বুঝে, ভালোবেসে বুকে টানে।

মা মিথ্যাবাদী: না খেয়ে বলে খেয়েছি, পেটে খিদে থাকা সত্ত্বেও নিজে না খেয়ে প্রিয় খাবারটা সন্তানের জন্য তুলে রাখে।

মা বোকা: সারাজীবন কলুর বলদের মতো রান্নাঘর আর আমাদের ভালোমন্দের পিছনে কাটিয়ে দেয়।

মা চোর: বন্ধুদের সাথে পিকনিকে যাব বললে, রাতেই বাবার পকেট থেকে টাকা চুরি করে আমাকে দেয়।

মা নির্লজ্জ: মাকে কতবার বলি আমার জিনিসে যেন হাত না দেয় তবুও মা নির্লজ্জের মতো আমার এলো-মেলো পড়ে থাকা জিনিসগুলো গুছিয়ে দেয়।

মা বেহায়া: আমি কথা না বললেও জোর করে এসে বেহায়ার মতো গায়ে পড়ে কথা বলে।

মায়ের কোনো কমন সেন্স নেই: আমার প্লেটে খাবার কম দেখলে কেমন যেন করে, মা এত খাবার কম খাস কেন, বলেই প্লেটটা ভর্তি করে দেয়।

মা কেয়ারলেস: নিজের কোমরে ব্যথা, পিঠের ব্যথায় ধুকে ধুকে মারা গেলেও কখনো ওষুধের কথা বলে না।

মা আনস্মার্ট: অনেকের মায়ের মত করে দামী দামী শাড়ি পরেনা, ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে, স্মার্ট ফোন নিয়ে ঘোরে না।

মা স্বার্থপর: নিজের সন্তান ও স্বামীর জন্য মা দুনিয়ার সব-কিছু ত্যাগ করতে পারে।

পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মনে হয় মায়েরা, তাই বুঝি আমরা সন্তানেরা তাদের এত কষ্ট দিই, একটু বড় হয়ে গেলেই তাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিই।

প্রশ্ন

কিশোর সাহা
৬ষ্ঠ সেমিস্টার

তুমি গর্জে ওঠনি সেদিন, যেদিন ভোরে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল শরীর পিপাসু পশুদের শিকার। সেদিনও তুমি চুপ ছিলে যেদিন তারা আঘাত করেছিল নারী জাতীর সম্মানে। যেদিন তারা এক অসহায় নারীকে দেখতে চেয়েছিল নগ্ন অবস্থায়। তুমি সেদিনও চুপ ছিলে, যেদিন মানুষ হয়ে উঠেছিল হিংস্র।

তুমি তো বিজয় লাভ করেছো কত-শত যুদ্ধে। ভারতের মাটি থেকে চিরতরে বিদায় দিয়েছো ইংরেজদের শাসন ব্যবস্থাকে। ভারতীয়দের মুক্তি দিয়েছো পরাধীনতার গ্লানি হতে।

তবে আজ কেন চুপ করে আছো তুমি? কেন অসহায়দের উদ্দেশ্যে বলে উঠছোনা আবার—"-তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।" কেন আজ শোনা যায় সেই সংগ্রামী বীরের হুঙ্কার! আজ কোথায় সেই ইংরেজদের বুক কাঁপিয়ে দেওয়া ভাষণগুলো? ভরতীয়দের মেনেছ নিজের ভাই-বোন বলে। আজ তোমার আদর্শ নিয়ে রাজনীতি চলছে তোমারই স্বপ্নে স্বাধীন ভারতবর্ষে। তোমাকে নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে রাজনৈতিক বৈঠকে, তোমার ছবিতে মালা চড়িয়ে নিজেকে দেশভক্ত প্রমান করছে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না সেই মালায় লেগে থাকা রক্তের কালো দাগ?

তোমার জন্মদিনে অনুষ্ঠান রেখে রক্তদান শিবির খোলা হয় এই দেশে, সেই রক্ত বিক্রি করে অর্থ লুঠ করছে এরা। এরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যায় করে বাঈজি নাচায় অথচ অসহায় মানুষের মুখে তুলে দেয়না বেঁচে থাকার রসদটুকু। তোমাকে সামনে রেখে মুনাফা লুঠে চলেছে ক্ষমতাধীন রাজনীতিবিদেরা।

সহসা লুঠ করে আসছে তারা দেশের সম্পদ, তারা রাতের অন্ধকারে প্রকাশ্যে লুঠ করছে নারীর সম্মান। তুমি যে নারীকে মা বলে জেনেছো, সেই নারী তাদের ভোগের পাত্র মাত্র। যে ভারতীয়দের হাতে একদিন তুমি তুলে দিয়েছিলে তোমার স্বাধীন ভারতবর্ষ। সেই ভারতীয়রা আজ ভারতবাসীকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে পরাধীনতা।

তুমি তাও চুপ থাকবে নেতাজি?

তুমি ইংরেজদের তাড়িয়েছ, তারা ভারত লুটতে এসেছিল বলে। আজ তো ভারতীয়রাই লুট করছে দেশের সম্মান। যদি এমনটাই হওয়ার ছিল তবে কেন স্বাধীনতা দিয়েছিলে ইংরেজদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে। কেন জাতি, ধর্ম-বর্ণ কে অগ্রাহ্য করে বলেছিলে আমরা ভারতীয়রা একে অপরের ভাই। আজ ধর্ম নিয়েও চলছে রাজনীতি।

নেতাজি, আমরা তো শান্তি চেয়েছিলাম, আমরা স্বধীনতা চেয়েছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম হিংসা বিহীন ভারতবর্ষ। তুমি যদি চলেই যাবে তবে কেন তৈরি করে রেখে গেলে না আর একজন নেতাজীকে, তোমার এই স্বাধীন ভারতবর্ষের বুকে? কেন নেতাজী? কেন?

কঠোর পরিশ্রমী তরুন

মোস্তাফিজুল সেখ
৩য় সেমিস্টার,
রোল:২৪৪

মোস্তাফিজুলের বাবা ছিলেন এক কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রিয় লোক। মোস্তাফিজুল কোন প্রশ্ন না করে সেই সমস্ত নিয়মের বাধ্য হতে শিখেছিল। মিথ্যা কথা বলা, ঠকানো, চুরি করা এবং সম্পত্তি ধ্বংস করার বিষয়গুলো তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। শিখেছিল যে অলসতা হল সব থেকে মন্দ বিষয়গুলোর মধ্যে একটি বিষয়।

এক তরুণ হিসাবে সে তার পিতাকে মৎস্য চাষের কাজে সাহায্য করত। মোস্তাফিজুল সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলেজে পড়াশোনা ও টিউশন করত। ঘরের ছোটো ছেলে হিসাবে তাকে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হতো। যেমন—কৃষিকাজে হাত লাগানো, মৎস চাষ, টিউশন পড়ানো তার এই সমস্ত কাজ করার জন্য তাকে সব কিছু আগ্রহি বা প্রস্তুত থাকতে হত। এর ফলে তার কলেজের পড়শোনার কাজ সে ঠিক মতো করতে পারতেন না। তবুও সে কখনো হাল ছাড়েন নি। তার এই ব্যস্ততার মধ্যেও কলেজে মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করত।

সে তার গ্রামে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে, প্রশংসার সঙ্গে তাঁর জীবনের প্রথম দিকের দিনগুলোর কথা স্মরণ করেন। কারন তাঁর বাবা ও মা তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে শিখিয়েছিলেন। মাঝে মধ্যে তাদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি হলেও মোস্তাফিজুল সেখ কখনও তাঁদের কারও মুখ থেকে কোন অহংকারি বা খারাপ অপবিত্র কথা শোনেন নি। তার ভাইবোনদের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধন ছিল। বিশেষ করে তার বন্ধু আব্দুল সালামের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। তারা দুই শয্যাবিশিষ্ট একটি ঘরে থাকত এবং ক্রমবর্ধমান কাজের দায়িত্বগুলোকে একত্রে গ্রহণ করত।

তার গ্রাম্য জীবনযাত্রার মধ্যে শহরের মটর সাইকেলের প্রতি আকুল আকাঙ্খা ছিল। মাত্র বারো বছর বয়েসে সে সাইকেল চালিয়েছিল এবং আঠারো বছর বয়েসে সে তাঁর গ্রামের নিকটবর্তী রাস্তায় মটরসাইকেল। একবার নিজেকে জাহির করার জন্য জলাজমির প্রচণ্ড কাদার মধ্যে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে বেপরোয়া ভাবে লাঙ্গল বা হাল দিয়েছিল। এখন সে অনেক সমৃদ্ধ। বুদ্ধিতে এবং বয়সে।

নির্বাচনী বন্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন

শাহাজাহান লস্কর
পলিটিক্যাল সায়েন্স, ৬ষ্ঠ সেমিস্টার
রোল: ৯০৪

একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গণতন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে যেখানে প্রতিটি নির্বাচনী চক্রের সাথে জাতির ভাগ্য ভারসাম্যের সাথে ঝুলে থাকে। সেখানে গোপনীয়তা এবং বিতর্কে আবৃত একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল যা নির্বাচনী বন্ড নামে পরিচিত। রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত এই আর্থিক উপকরনগুলি তীব্র তদন্ত ও বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে।

এই কাহিনি আমার বন্ধু শুভর। শুভ একজন তরুন এবং উচ্চাভিলাষী সাংবাদিক যিনি সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য জ্বলন্ত আবেগের সাথে বছরের পর বছর, যিনি ক্ষমতার করিডোরের মধ্যে দুর্নীতি ও কুফল প্রকাশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। যখন নির্বাচনী বন্ডের কানাঘুষা শুরু হয়, তখন শুভ প্রতারনার স্তরগুলিকে পিছিয়ে দেওয়ার এবং তাদের প্রভাবের প্রকৃত পরিমান প্রকাশ করার একটি সুযোগ অনুভব করেছিলেন।

দৃঢ় সংকল্প এবং ন্যায়বিচারের তৃষ্ণায় সজ্জিত, শুভ রাজনৈতিক অর্থের অন্ধকার জগতে গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি তথ্যের পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চিরুনি দিয়েছিলেন, ব্রেডক্রাম্বের একটি লেজ একসাথে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলেন যা তাকে বিষয়টির হৃদয়ের আরও কাছে নিয়ে গিয়েছিল। পথের মধ্যে, তিনি তাদের গোপনীয়তা গোপন রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শক্তির প্রতিরোধের সম্মুখীন হন।

কিন্তু শুভ নিবৃত্ত হতে রাজি হননি। প্রতিটি প্রকাশের সাথে, তিনি নির্বাচনী বন্ডের আশেপাশের গোপনীয়তার আবরণ তুলে ফেলেন, রাজনীতিবিদ, কর্পোরেশন এবং ধনী দাতাদের মধ্যে সংযোগের জটবদ্ধ জাল উন্মোচন করেন। তিনি quid pro quo-এর উদাহরণ উন্মোচন করেছিলেন, যেখানে আর্থিক অবদানের জন্য রাজনৈতিক সুবিধার আদান-প্রদান করা হয়েছিল। এবং তিনি পদ্ধতিগত ত্রুটিগুলির উপর আলোকপাত করেছিলেন যা এই ধরনের অনুশীলনগুলিকে পাথেয় করেই উন্নতি করতে হয়।

শুভর তদন্তে ট্র্যাকশন পাওয়ায়, তিনি তাদের লক্ষ্যে পরিণত হন যারা যেকোনো মূল্যে তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। হুমকি দেওয়া হয়েছিল, ঘুষের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং তার কাজকে অসম্মান করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু শুভ তার মিশনে অবিচল ছিলেন, জেনেছিলেন যে সত্যের জন্য লড়াই করা মূল্যবান।

শেষপর্যন্ত শুভর প্রচেষ্টার ফল দেয়। নির্বাচনী বন্ডের বিষয়ে তার প্রকাশ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধাক্কা দেয়, সংস্কার ও জবাবদিহিতার আহ্বান জানায়। জনসাধারণের ক্ষোভ ছিল বধির, কারণ নাগরিকরা তাদের নির্বাচিত কর্মকর্তাদের কাছ থেকে উত্তর এবং স্বচ্ছতা দাবি করেছিল।

যদিও সামনের রাস্তাটি দীর্ঘ এবং চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ হবে, শুভ জানতেন যে তার কাজ সবে মাত্র শুরু হয়েছে। সত্যের শক্তি এবং জনগণের সমর্থনে সজ্জিত, তিনি আরও ন্যায্য ও স্বচ্ছ গণতন্ত্রের জন্য তার ক্রুসেড চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যেখানে অর্থের প্রভাব আর কখনও জনগণের কণ্ঠকে ছাপিয়ে যেতে পারে না।

বেগম রোকেয়া

আয়েষা খাতুন
এডুকেশন (অনার্স), ১ম সেমিস্টার
রোল-২০২৩৫

ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস গল্পকাহিনী ও শ্লেষাত্মক রচনায় তাঁর লেখনীভঙ্গি ছিল স্বকীয়। উদ্ভাবনা, যুক্তিবাদিতা এবং কৌতুকপ্রিয়তা তাঁর রচনার সহজাত বৈশিষ্ট্য। বেগম রোকেয়া আমাদের নারী সমাজের জন্য অনেক সহজ কাজ করে গেছেন। যখন অন্ধকারে জর্জরিত ছিল গোটা মুসলিম সমাজ, শিক্ষা ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ প্রত্যেক মুসলিম নারীর উপর। যখন তাদেরকে লুকিয়ে রাখা হত পর্দার আড়ালে, বঞ্চিত করা হত সমস্ত অধিকার থেকে, ঠিক সেই সময়ে শিক্ষার বাণী কণ্ঠে নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই অগ্নিকন্যা বেগম রোকেয়া। শিক্ষা যে জাতির মেরুদন্ড এবং তা যে সকলের প্রাপ্য এক নিমিষে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, শিক্ষার আলো থেকে কেউ বঞ্চিত হতে পারে না। না পুরুষ না নারী, সকলের সমান অধিকার হওয়া দরকার! তিনি বলেছেন যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিসয় দৃঢ় সেখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক, তাঁর হাত ধরে অজস্র নারী শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়েছিল। ধর্মের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে উজাড় করে দিয়েছিল নিজেদের শিক্ষার কাজে এবং দেশের কাজে, নানান বাধা বিপত্তি কাটিয়ে এবং ননান সামাজিক বাধা অতিক্রম করে তিনি নারীদের মধ্যে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই সব অসহায়, বঞ্চিত নারীদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'সাখাওখাত মেমোরিয়াল স্কুল'। অসংখ্য অসহায় আর্ত মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, তাদেরকে স্বনির্ভর করেছিলেন নিজে হাতে, মেয়েরা যে পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

জন্ম পরিচয়: ১৮৮০ সালে ৯ই ডিসেম্বর অধুনা বাংলাদেশে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক অভিজাত পরিবারে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন। তাঁর পিতার নাম—জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের। তাঁর পিতা ছিলেন একজন জমিদার। তিনি নিজে উর্দ্দু, হিন্দি, আরবী ও ফার্সি ভাষায় পারদর্শী হলেও তিনি নারীদের শিক্ষার বিষয়ে ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল। তাঁর তিন কন্যা ছিল। তাঁর মধ্যে বেগম রোকেয়া দ্বিতীয়।

তাঁর দুই পুত্র ইব্রাহিম আবুল আসাদ ও খলিসুর রহমান সাবেরকে তিনি কোলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কন্যাদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি কোনো উদ্যোগই নেননি। বেগম রোকেয়ার মাতার নাম—রাহাতুন্নেসা সাবেয়া চৌধুরানী। রোকেয়ার বড় বোনের নাম—কারিবন্নেসা এবং ছোটো বোন হলেন হুমায়ারা। কারিবন্নেসা বিবাহের পর একজন কবি হিসাবে নিজের পরিচয় তৈরি করেছিলেন।

শিক্ষাজীবন: ছোটো থেকেই রোকেয়া এবং তাঁর বোনদের লেখাপড়ায় প্রবল উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। সেই সময়ে নারীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধা ছিল না। সেই কারণে রোকেয়ার প্রাথমিক শিক্ষা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হয়নি। বাড়িতেই যখন বড় দাদারা পড়তেন সেই সময় পিতাকে লুকিয়ে তাঁদের পড়া শুনে তিনি জ্ঞান অর্জন করতেন। পাঁচ বছর বয়সে রোকেয়া মাতার সাথে কোলকাতায় এলে তখন নিজের বাড়িতেই স্যার ডেকে পড়াশোনা করার সুযোগ ঘটে। কিন্তু সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনের কটাক্ষের কারণে তাঁর মাতা রোকেয়ার সেই পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। পড়ার প্রতি রোকেয়ার অসীম আগ্রহ দেখে তার বড় ভাই ও তার বড় বোন এগিয়ে আসেন।

রোকেয়ার জীবনে তাঁর বড় বোন ও বড়দাদার ভূমিকা ছিল অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত তাঁদের সহযোগিতায় রোকেয়া আরবী, ফার্সি, উর্দু ও বাংলা ভাষার সাথে পরিচিত হন। তাঁর বড় বোন ছিলেন একজন বিদ্যানুরাগী, পিতার নজর বাঁচিয়ে রোজ রাত্রে পড়তে যেতেন দুই বোন বড় দাদার কাছে। কিন্তু একদিন তাঁরা ধরা পড়ে যান তাঁর পিতার কাছে। তাদের পড়াশোনা বন্ধ করে দেন তাঁর পিতা। আর রোকেয়ার বড় বোনের মাত্র এগারো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে দিয়ে দেন তাঁর পিতা। এরপর রোকেয়ারও আসল শিক্ষা শুরু হয় তাঁর বিবাহের পর।

বৈবাহিক জীবন: ১৮৯৮ সালে আঠারো বছর বয়সে আটত্রিশ বছর বয়সী ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ শাখাওয়াত হোসেনের সাথে বেগম রোকেয়ার বিবাহ হয়। সৈয়দ শাখাওয়াত ছিলেন রয়্যাল এগ্রিকালচার সোসাইটি অফ ইংল্যান্ডের একজন সদস্য। রোকেয়া ছিলেন তাঁর স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী। তাঁর প্রথম পক্ষের একটি কন্যা সন্তান ছিল। এবং পরবর্তীকালে রোকেয়া ও শাখাওয়াতের দুটি কন্যা সন্তান হয়। কিন্তু তাদেরই শৈশবেই মৃত্যু হয়। তাঁর স্বামীর প্রদান করা অর্থেই পরবর্তীকালে বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠা করেন শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল।

মূলত তাঁর স্বামীর উৎসাহে ও সহযোগীতাই রোকেয়া ইংরাজি ভাষা আয়ত্ত করেন। ইংরাজি শেখার ফলে তিনি দেশ বিদেশের বহু লেখকের রচনার সংস্পর্শে আসেন যা তাঁকে পরবর্তীকালে ইংরাজিতে সাহিত্য সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল। যেহেতু তাঁর স্বামী ছিলেন একজন উর্দ্দু ভাষী, সেই কারণে তাঁর উর্দ্দু ও হিন্দি ভাষাতেও যথেষ্ট দক্ষতা ছিল কিন্তু বাংলা ছিল তাঁর প্রাণ। বাংলা ভাষাতেই তিনি নিজের রচনাগুলি করে গিয়েছেন। তবে বেগম রোকেয়ার বিবাহিত জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯০৯ সালে শাখাওয়াত হোসেন মারা যান।

সাহিত্যচর্চা: বেগম রোকেয়ার সহিত্যিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯০২ সালে 'পিপাসা' নামক গল্পের মাধ্যমে। এই গল্পটি তাঁর প্রথম লেখা যেটি কোলকাতার 'নবপ্রভা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর স্বামীর সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায়। তাঁর দ্বিতীয় সাহিত্যকর্ম 'মতিচুর' হল একটি হাস্যরসাত্মক রচনা। এই প্রবন্ধে তিনি নারী পুরুষদের সমান অধিকার দিয়েছেন।

ব্যঙ্গ বিদ্রুপের সাহায্যে সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে তিনি প্রতিবাদী হয়েছিলেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। তাঁর লেখা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী 'সুলতানার স্বপ্ন' এক অভাবনীয় লেখনী। সেই যুগে দাঁড়িয়ে যেখানে নারীদের প্রাথমিক শিক্ষালাভ দিবাস্বপ্ন ছিল, সেখানে তিনি বলেছিলেন 'যে কাজ পুরুষ করতে পারে সেই কাজ একজন নারীও করতে পারবে।" তাঁর এই ধারণা যে কতখানি দুরদর্শী সম্পন্ন ছিল তা তিনি সময়ের সাথে সাথে প্রমাণিত করেছেন।

এরপর ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর পদ্মরাগ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি তিনি তাঁর বড় ভাই ইব্রাহিম আবুল আসাদ সাবেরকে উৎসর্গ করেন। ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'অবরোধবাসিনী' নামক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি নারীদের পর্দাপ্রথা নিয়ে সোচ্চর হন। এবং তিনি এই পর্দাপ্রথার তীব্র সমালোচনা করেন। নারীকে শিক্ষিত হতে হবে এবং নিজের পছন্দ মতো পেশা বেছে নিতে হবে। তা না হলে নারীর মুক্তি নেই।

জীবনাবসান:

অবশেষে ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর কোলকাতায় তাঁর জন্মদিনেই বেগম রোকেয়া পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৩ বছর। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে উত্তর কোলকাতায় সোদপুরে কবরস্থ করা হয়।

ধর্মের আঁচড়ে বাস্তব

আরমান মোল্লা
বি.এ. (জেনারেল), ২য় বর্ষ
৪র্থ সেমিস্টার

প্রতিটা মানুষই নিজ ধর্মকে বিশ্বাস করে।
কিন্তু আমার প্রশ্ন হল ধর্মের মানেটা কি।

কিছু লোক বলেন অতি সহজ কথায় বলা যায় তো ধর্মের মানে হল, ''প্রেম'', ''বন্ধুত্ব'', ''ভালবাসা'', একবদ্ধতা। পথ ভ্রষ্ট লোকেদের আলোর দিশা দেখানো, চায় সেটা ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন কিছু নিয়ম থাকুক না কেন। (উইলিয়াম পেন বলেন, ''ধর্ম, অর্থ, ঈশ্বরের প্রতি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা ব্যতীত কিছুই বুঝায় না।'')

আমিও এই বিষয়গুলোর সাথে একমত। আমি মানি যে 'ধর্ম' মানুষের সঠিক রাস্তা দেখাতে পারে। 'ধর্ম' মানুষকে সঠিক রাস্তায় আনতে পারে, 'ধর্ম মানব সমাজকেও সব কিছুই দিতে পারে যেগুলো মানব সমাজকে উন্নত করতে পারে।

কিন্ত মানুষ কি আসলেই নিজের ধর্মকে মানছে নাকি ধর্মের নামে অরাজকতা সৃষ্টি করছে। মানুষ দুবেলা না খেয়ে থাকতে রাজি, বাড়ির সামনের রাস্তাটা খারাপ, নিজের ঘরের চাল নেই, নুন আনতে পান্তা ফুরায়, তবুও মানুষের কোন প্রবলেম নেই। কিন্তু কেউ যদি নিজের ধর্মের নামে কিছু বলে, সেখানেই 'তাণ্ডব' হয়ে যাবে, সেখানেই মাথা ফাটাফাটি খুনোখুনি। কারণ মানুষ আবেগে বিশ্বাসি। (বার্নার্ড রাসেল বলেন, ''মানবতাই মানুষের একমাত্র ধর্ম হওয়া উচিত।'')

প্রতিটা ধর্মই ভালো কথা বলে, কিন্তু ধর্মের চোখে তুমি যদি মানুষকে বিচার করতে চাও একদিন না একদিন দ্বন্দ্ব আবার হবে।

চাই ধর্ম যতই ভালো কথা বলুক না কেন ধর্মের দৃষ্টিতে কথা বললে অন্যদের আপত্তিকর চিন্তাধারা অবশ্যই ফুটে উঠবে। তারা ঈর্ষা করবে, মতভেদ সৃষ্টি করবে, আবার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে। তাই ''এই পৃথিবীটাকে'' ''এই দেশটাকে'' এই সমাজটাকে ধর্মীয় নজরে না দেখে মানবতার দৃষ্টিতে দেখি, দেখবে এই পৃথিবাটা অনেক সুন্দর হয়ে গেছে, আর এই সুন্দরতা যে কতটা রোমাঞ্চকর তা তুমি আন্দাজও করতে পারবে না। কারণ হিংসার থেকে হানিকারক আর কিছুই নেই, সব ভালো কিছুকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

আমি জানি তবুও কিছু মানুষ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মের নামে অধিকারের অঙ্গীকার জানাবে। অন্যের ''চিন্তাধারার'' উপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেবে আর বলবে এটাই সঠিক। যেমন, কেউ নামাজ পড়লে, বলবে নামাজ পড়ো না, পূজা অর্চনা করো এটাতেই তুমি ঈশ্বর প্রাপ্তি করবে, এবং কেউ পূজা অর্চনা করলে, বলবে নামাজ পড়ো এটাই তোমার জান্নাতের মূল চাবিকাঠি হবে। তাই আমি বলি ধর্মীয় মানুষ এবং ধর্মীয় চিন্তাধারা হামেশাই মতভেদ সৃষ্টি করবে, কেউই নিজ ধর্মীয় চিন্তাধারার বিপক্ষে শুনতে চাইবে না।

তাহলে কি আর এই সমাজে শান্তি কায়েম হতে পারে না?

দিনের শেষে আমরা সবাই একটাই জিনিস চাই সেটা হলো শান্তি। আর এই শান্তি কায়েম রাখতে হলে ধর্মীয় চিন্তাধারা থেকে বের হয়ে আসতে হবে, ধর্ম থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

''প্রশ্ন উঠতে পারে তার মানে কি নাস্তিক হয়ে যাওয়ার কথা? ধর্মের চিন্তাধারার সাথে জুড়ে থাকা মানুষদের ধার্মিক বলে। ধর্মীয় চিন্তাধারার বাইরে যাওয়া মানে তো এটাই বোঝায় ধর্ম ত্যাগ করা বা নাস্তিক হয়ে যাওয়া। -তো এখানেই আমার আসল প্রশ্ন?

আসলে ধর্ম বলতে কী বোঝায়? (আমি ধর্মে বিশ্বাসী নই সেটা নয় তবে কখনো কখনো এ প্রশ্নগুলো খুব ভাবায় আমাকে) আচ্ছা একটা কথা বলোতো ধর্মের অস্তিত্ব আসলেই আছে কি? (Is religion real or faith) ধর্ম কি বাস্তবভিত্তিক নাকি বিশ্বাসে? আমি জানি ধর্ম বা ধর্মের ঈশ্বর হলো আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু লোক মানতে চায় না 'বিশ্বাসের' বিপরীতে শুনতে চায় না। কারণ এই 'বিশ্বাসটা' অটুট এবং গভীর। মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপক্ষে যেতেও চায়না, কোন কথা শুনতেও চায় না। এটার জন্য মানুষ মারামারি কাটাকাটি হানাহানি সবকিছুই করতে পারে।

কেউ যদি এই বিশ্বাসের বিপক্ষে ধর্মের নামে কিছু সঠিক কথাও বলে.....তবুও গ্রহণ করতে চায় না। এই বিশ্বাস এতটাই ভয়ানক যে এটার জন্য মানুষ একে অন্যকে 'কাফের' 'নাস্তিক' 'ধর্মবিরোধী' ভিন্ন তক্‌মা দিয়ে থাকে। আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি...প্রতিটা ধর্মের কিতাবই বলে যে তাদের ঈশ্বর মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছে, সব প্রাণীকুলকে সৃষ্টি করেছে। সব জড় বস্তুকে সৃষ্টি করেছে। এই পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কে সৃষ্টি করেছে। সে সর্বশক্তিশালী।

পৃথিবীতে সর্বমোট ৪ হাজারেরও বেশি ধর্ম আছে। -আজ পর্যন্ত কোন ধর্মের ঈশ্বর তো এসে বলেনি যে আমি তোমাদের ঈশ্বর। আমি সর্বশক্তিশালী তোমরা আমার আরাধনা করো! এ প্রমাণ তো কেউ দেখায়নি। তাহলে আমরা কিভাবে বুঝব ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, এত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এতগুলো ধর্মের মধ্যে 'কোনো' ঈশ্বর কেন আসেনি মানুষের সামনে। নাকি সব ধর্মের একই কথা বলেছে যে মৃত্যুর পরেই আমি তোমাদের সামনে প্রকট হব তার আগে নয়। নাকি এটা মানুষের চালাকি যেহেতু সত্যিটা সামনে না আসে সেহেতু এই কথাটা বলে ছড়িয়েছে যে ঈশ্বর মৃত্যুর পরে উপলব্ধি হবে।

অনেকেই বলে ধর্মীয় চিন্তাধারা ত্যাগ করা মানে নাস্তিক হয়ে যাওয়া' এবং নাস্তিকরা পাপ পুণ্যের কথা ভয় করে না। তারা তখন কোনো খারাপ কাজ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। পাপ পুণ্যের কথা ভেবে তবু ধর্মীয় মানুষেরা ভালো পথে আছে। সেখানে আমার এক প্রশ্ন...? আচ্ছা তাই যদি হয় বিশ্বজুড়ে ''একশ কুড়ি'' কোটিরও বেশি মানুষ যারা সবাই ধর্মে বিশ্বাসী নয়। তো তারা কি মারামারি হানাহানি হিংসা বাদী হয়ে বেঁচে আছে, তারা কি আজকের সভ্য সমাজে পা দেয়নি? যত অশান্তি কি নাস্তিকদের মাঝে? আপনারা কি জানেন বেশিরভাগ ধর্ম অবিশ্বাসী মানুষেরা ইউরোপ এবং বিভিন্ন উন্নতমানের দেশগুলোতে আছে। যারা খুবই (highly educated) তো বেশি শিক্ষিত হওয়ার মানে কি ধর্ম থেকে বার হয়ে আসা নাকি তারা 'মিথ্যে বা সঠিক'—'আবেগ বা বাস্তবে' এর পার্থক্যটা বুঝে গেছে।

একটা গল্প বলি। আমি তখন খুব ছোট, আমাদের বাড়ি বেশ কয়েকটা ঘর আছে, তারমধ্যে একটা কামরা ছিল যে ঘরটা বেশ অন্ধকার এবং সে ঘরটাতে রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় এটা সেটা বিভিন্ন জিনিস রাখা থাকতো, আমি খেলাধুলো ছোটাছুটি করতাম ওই ঘরটাতে গিয়ে এটা সেটা ফেলে দিয়ে আসতাম যেহেতু ছোট ছিলাম। বাড়ির লোক আমার জ্বালায় চিন্তিত, সব কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতাম। সেইসব শুনে আমার নানা একদিন আমাকে বলে ওই ঘরটাতে যাবি না। ওই ঘরে যে 'অন্ধকার' ওখানে একটা লোক মারা গিয়েছিল তার আত্মা ওখানে থাকে মানে ভূত। ওই ঘরে ভুলেও যাবি না।

আমি ভয়ে ভয়ে কখনো যেতাম না ওই ঘরটাতে বেশিরভাগ সময় দরজা লাগানো থাকত, যদিও তালা লাগানো থাকত না। কারণ আসল ভয়টা তো আমার ভেতরটাকে কাবু করে ফেলেছে। তো সেই ভয়ে আমি এমনিতেই যেতাম না। আমি ভাবতাম সত্যি সত্যিই ওখানে কিছু আছে। যখন কোন কিছুর দরকার থাকতো তখন বড়রা গিয়ে এটা সেটা আনতো। আমি অনেক 'বড়বেলা' পর্যন্ত ই ঘরটাতে যেতাম না 'ভয়ে'।

২০১৯ সালে আমার নানা মারা যায়, তো আমি একদিন ওই ঘরটাতে একা একা যাই, সাহস জাগিয়ে, যদিও তেমন একটা ভয় লাগছিল না। কারণ আমি সেই দিন একটু ইমোশনাল ছিলাম, ভেবেছিলাম যা দেখতে পাই পাব...তবু ভয় করব না। গিয়ে দেখি একটা তাজ্জব জিনিস যেটা আমার পুরো দৃষ্টিকোণ বদলে দিয়েছে, সারা জীবন যা আমি শিখেছি, সেই শেখার আসল রহস্যটা যেন আমি জেনে গেছি। ভিতরে গিয়ে ওই 'অন্ধকার' জায়গাটাতে কি দেখলাম জানো, সেটা হলো 'কিছুই না'। ফাঁকা এক অন্ধকার জায়গা সেখানে কিছুই নেই।

রাগে ফুঁসছি, কষ্টে কাতরাচ্ছি বিভিন্ন চিন্তাধারা মাথায় আসছে সে একটা অসহ্যকর অনুভূতি। ভাবছিলাম সারা জীবন আমার 'নানা' 'নানি' 'আম্মাজি' আমাকে বোকা বানিয়ে এসেছে। আমি এক পাগল, আমার থেকে পাগল এই দুনিয়ায় কেউ নেই। ওখানে বসে বসে নিরবে কাঁদছি, যেহেতু আগে থেকেই একটু ইমোশনাল ছিলাম। একটু পরে ভাবলাম আমি কি আসলেই বোকা ছিলাম নাকি এই পুরো বিশ্বই বোকা হয়? তো আমি বুঝলাম যে সত্যি বলতে 'ভূত' কখনো ওই কবরে থাকে না যেখানে প্রতিদিন লাশ দাফন করা হয়!

ভূত ওখানে থাকে না যেখানে অন্ধকার বাঁশ বাগান, নির্জন স্থান। ভয়ংকর দেখতে জায়গা, ভূত ওখানে থাকে না। যেখানে বীভৎস্যকর দেখতে, ভয়ানক, খুনি, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি, মার্ডার করা ব্যক্তি বিষ খাওয়া ব্যক্তি, গলায় দড়ি দিয়ে মরা ব্যক্তি, যাদের লাশ পোড়ানো হয় ওই শ্মশানে। ভূত ওখানে থাকে না? ভূত কখনো ওই অন্ধকার জায়গাটাতে ছিল না যেখানকার কথা আমার নানা বলতো। সত্যি বলতে ভূত থাকে ঠিক, 'দুই বাহুর মাঝখানে', 'গলার নিচে', 'নাভির উপরে', বাঁদিকের ওই ঘরটাতে, হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ? ভূত ছিল ঠিক আমাদের এইখানটাতে, 'আমাদের ওই 'হৃদয়টাতে', আমাদের মনের মধ্যখানে'। ভূত এটা আমাদের একটা কল্পনার সৃষ্টি, এটা আমাদের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। আমার নানা একটু নরম গলায় কি বলেছিল আমি অর্ধেক সময়ে ওই মিথ্যেটাকে বুকে বেঁধে বিশ্বাস করে চলেছিলাম। বুঝলাম যে মানুষ যদি কল্পনাকে নিয়ে একটু ভালোভাবে বোঝাতে পারে, সে পুরো দুনিয়ার লোক কেও পাগল বানাতে পারে। বলাই বাহুল্য আমার এই বিশ্বাসটা এতটাই অটুট ছিল যে এত লম্বা সময় পর্যন্ত আমি 'মনের অন্ধকার' থেকে বার হয়ে আসতে পারিনি। তাই বুঝলাম ভূত আর ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তুমি হিন্দু, আমি মুসলিম, সে খ্রিস্টান এসব তো আমাদের পূর্বপুরুষের থেকে জন্মের পর থেকে জানলাম।

আর যদি আমরা নাস্তিকদের ঘরে জন্ম নিতাম তাহলে কি ধর্ম নিয়ে এতটা বড়াই করতাম। তখন তো এটাও জানতাম না ঈশ্বর বলে কিছু আছে। ধর্মীয় বিশ্বাসী মানুষেরা তোমার মধ্যে এই অনুভূতিটা জাগিয়েছে গল্পকথার মত.....নিজের থেকে তো আর উপলব্ধি করোনি তাই না.... তাহলে এত কি? তেমনি ধর্মটাও 'হয়তো' এক কল্পনা, যেটার সত্যতা আমরা এখনো প্রমাণ করতে পারেনি। শুধু বিশ্বাসের উপরে টিকে আছি। জানিনা একটা কথা আমি কোথা থেকে শুনেছি, তবে আমি সেটা বন্ধুদেরকে প্রায় বলি-ওই মানুষগুলো অন্ধকারে দাখিল হয়ে গেছে যারা বস্তবকে দূরে সরিয়ে কল্পনা এবং বিশ্বাসকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে।

আমি এটা বুঝেছি এতদিনে মিথ্যে কল্পনা বা অপ্রমাণিত বিশ্বাসের অধীনে হলে, তুমি দুনিয়াতে শুধু কষ্টই পাবে এবং একটা সময় অন্যকেও কষ্ট দেবে। তাই আমি চাইবো যে জিনিসটা তোমার বিশ্বাসে জায়গা পেয়েছে, সেই জিনিসটাকে তুমি কদর করতে পারো, কিন্তু তার আগে বাস্তবটাকে আগে কদর করো এবং এটা খুবই জরুরী।

মানুষের অস্তিত্ব আছে এটা বাস্তব, তাই এই বাস্তবটাকে স্বীকার করে' ভাই ভাইয়ের মতন চলো এবং এটাকে অন্তর থেকে প্রাধান্য দাও। বিশ্বাসে যেটা আটকে আছে সেটাকে না হয় পরে প্রাধান্য দিও। আমি বলতে চাইছি বিশ্বাস আর বাস্তবের যখন সংঘর্ষ হবে তখন তুমি বাস্তবটাকে আগে আঁকড়ে ধরো। ধর্ম-ধর্ম ভূত-ভূত বিশ্বাসে থাকা বিষয়টাকে নিয়ে বাস্তবে থাকা মানুষের মাথা ফাঁটিও না একে অন্যের পিঠে ছুরি মেরো না। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কখনো প্রাচীর গড়ে ওঠে না, সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর কে গালি দিলেও সে তৎক্ষণাৎ নিচে এসে তাকে সাজা দেবেনা, হয়তো পরেও দেবেনা। কিন্তু ওই সামান্য (Human) মানুষটাকে আঘাত করলে সে মারা যেতে পারে....তার অস্তিত্ব চিরতরে শেষ হয়ে যেতে পারে।

কেউ তোমার বিশ্বাসে আটকে থাকা ঈশ্বরকে বা যেকোন কিছুকে গালি দিলে তাকে যথাযথ বোঝানোর চেষ্টা করো কিন্তু সংঘর্ষ নয়।

প্রিয় অতীত

আরমান মোল্লা
২য় বৎসর, বি.এ. (জেনারেল)

আমাদের বাড়ি আর মামাদের বাড়ি বর্তমানে একই জায়গায়। আমার মামাতো বোনের বিয়ে হয়েছে 'বাবুরহাট দেউলী'।

তার একটা মেয়ে আছে, সম্পর্কে সে আমার ভাগ্নি হয়।

তাকে যখনই চোখের সামনে দেখি, সর্বদা মনমরা অবস্থায় থাকে। খুব একটা কথা বলেনা চুপ থাকে.... কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে 'হ্যাঁ হু' শব্দে উত্তয় দেয়... তাকে কোনো কাজ বললে চুপচাপ ভাবে করে 'টু' শব্দটুকু করে না..... একা একা বসে থাকে.....অথচ তার বয়স মাত্র ১৪-১৫ বছর, ক্লাস নাইনে পড়ে। এত হালকা বয়সে না জানি কোন ভাবনা-চিন্তায় ডুবে থাকে।... হয়তো খুশিগুলো অন্তরের জানালা ভেঙে উড়ান দিয়েছে.....আর দুঃখগুলো মনের কিনারায় ভিড় করেছে। এভবে তাকে আমি অনেকদিন ধরে দেখে আসছি।

-ভাগ্নি, নানার বাড়িতে একা ছিল কিছুদিন.....আজকে সে বাড়ি যাবে, এবং আমারও কিছু কাজ আছে 'দেউলীর' ঐদিকে।

তো তাকেও বাড়ির রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে নিজের গন্তব্যে যাব।

আমি আর সে 'বাসে' উঠে পড়লাম.... ও পাশের সিটে বসে আছে, সেই একই রকম ভাবে মনমরা হয়ে বসে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কিরে কি হয়েছে তোর, কোন কথা বলছিস না,

এরকম মনমরা হয়ে বসে আছিস'

কিছু হয়েছে কি তোর

'সবসময় এমন ভাবে থাকিস, কোনো কারো সাথে কথা বলিস না'

চুপচাপ বসে থাকিস একা এক জায়গায়, বাড়িতে কেউ কিছু বলেছে... নাকি কিছু হয়েছে।

সে তবুও একটা কথা বলল না'।

বুঝলাম যে ওর সেই 'কালো ছায়া' ঘাড়ে চেপেছে যে কালো ছায়া একটা বয়সে এসে প্রতিটা মানুষের কাঁধে কাঁধে আর ডুবিয়ে রাখে এক অচিন কষ্টের দরিয়ায়।

-ওর নাম সাবানা।

আমি: দেখ সাবানা, এই যে রাস্তাতে চলছি না এই রাস্তার শেষ মোড় পর্যন্ত আমি হয়তো যেতে পরবো না, আর না তুই আমার সাথে শেষ রাস্তার মোড় পর্যন্ত যেতে পারবি.... আমাদের প্রতিটা মানুষের গন্তব্য স্থান আলাদা আলাদা হয়ে থাকে.... আমাদের জীবনের রাস্তায় অনেক মোড় আসবে....কিন্তু আমাদের খুঁজে নিতে হবে আমরা কোন দিকে যাব।

বুঝে নিতে হবে এটা Wrong turn নাকি Right turn.... আমি জানিনা কোন কারনে এভাবে মন খারাপ

করে বসে থাকিস। কিন্তু এতোটুকু জানি কিছু একটা অভিশপ্ত পিঞ্জিরা মনটাকে কয়েদ করেছে।

সাবানা: তুমি কিছুই জানো না মামা।

ঘুরে বেড়ানো, কলেজে গিয়ে বন্ধুদের সাথে টাইম পাস করা, মেলায় গিয়ে আনন্দ করা, ফাঁকা সময়ে গল্প লেখা.... এসবের মধ্যেই তো থাকো তো তুমি, তুমি কি বুঝবে?

আমি: ও আচ্ছা তাই.... জানিস

এখন রাত হলে স্বপ্ন আসে না আর, কারণ সে স্বপ্নের জিনিসগুলো এখন আর নেই।

ভালোলাগা জিনিসগুলো পাওয়ার আশায় বসে থাকতাম'। ভাবতাম একদিন পেয়ে যাব.... যখন বুঝলাম এটাও আমার আয়ত্তের বাইরে, তো তখন স্বপ্নগুলো ও দুঃস্বপ্ন হয়ে মাঝরাতে ঘুমের দরজায় হানা দিত। সে এক অসহ্যকর যন্ত্রণা।

আগে স্কুলের ব্যাপারে টেনশনে থাকতাম.... পড়াশোনার ব্যাপারে, বন্ধুদের ব্যাপারে, ভালো লাগার সেই মানুষটার ব্যাপারে যাকে কখনো বলতে পারিনি,

ভয় পেতাম আজকের Homework হয়নি, তো টিচার দাঁড় করিয়ে না রাখে। ভয় পেতাম পরিস্থিতির কারণে বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক। সেই মেয়েটার হাসিতে মনে ঢেউ খেলতো....। আর একদিন স্কুলে না আসাতে মনের আকাশে কালো মেঘ জমতো।

জীবনে কিছু করে দেখানোর ইচ্ছা ছিল। মনে অনেক আশা ছিল' চোখের কোণে রঙিন স্বপ্ন ছিল....!!

-আজ কালো আঁধারে ঢাকা পড়েছে স্বপ্নগুলো"। 'মোরচে গেছে সে ইচ্ছেগুলো....। আজ রঙিন স্বপ্নগুলো বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যাওয়া মুহূর্তগুলো স্বপ্নে অপরূপ গল্প বানানো সেই মেয়েটার হাত ধরে জীবনে বাঁচতে চাওয়া ইচ্ছাটা, ''সব আজ স্মৃতির পাতায় বন্দী হয়েছে...।

সব মায়া দিয়ে তৈরি ভালোবাসার জিনিসগুলো অতীতে ছেড়ে এসেছি। 'সাবানা' বাস্তবে কিছু রয়ে যায়নি....!

আজ শুধু একটা লাশ পড়ে আছে। তাজ্জব বিষয় তাতে শুধু কোন রকম একটা জীবন আছে....!

কিন্তু সেটার ভেতরে আর কোন অনুভূতি বেঁচে নেই...! এখন আর রাত হলে চোখে রঙিন স্বপ্ন আসে না,

এখন আর কোনো সুন্দরী মেয়ের হাসিতে' মনে ঢেউ খেলে না। এখন আর অন্যের লেখা গল্পের বই পড়ি না। এখন নিজের যন্ত্রণাগুলো পাতায় লিখি সেটাই গল্প হয়ে যায়। আজও ইচ্ছা করে অতীতে গিয়ে ভুলগুলো শোধরাতে।

কিন্তু আমরা কেউ ঘড়ির কাটাকে পিছনে নিয়ে যেতে পারি না। যেটাই আমাদের সাথে 'বর্তমানে' হবে সেটাই কালকে গিয়ে ভাগ্য হিসেবে মেনে নিতে হবে।

তাই বর্তমানকে আমি পারফেক্ট বানানোর চেষ্টা করছি....!

''শুরু থেকে কেউ পারফেক্ট হয় না

কিন্তু হতে আমরা অবশ্যই পারি....!

সাবানা: ওই মেয়েটাকে খুব ভালবাসতে মামা..?

আমি : সত্যি বলতে ওকে স্বপ্ন দেখতে আমার রাতের প্রয়োজন হতো না.... আমি তো দিবাস্বপ্নও দেখতাম।

ও আমার খেয়ালে বেখেয়ালে, অন্তরের চার দেয়ালের প্রতিটা কোণায় ওর অনুভূতি মিশে ছিল। আর ওকে আমি ভালবাসতাম' শব্দটা তো অনেক কঠিন হয়ে গেল....! আমি তো ভালোবাসা বলতে কী বোঝায় সেটাও জানতাম না.... ও শুধু আমার অজান্তেই মনের কুঠিরে জায়গা করে নিয়েছিল..... অজান্তেই তাকে নিয়ে সর্বদা ভাবতাম।

ওকে যে ভালোবেসে ফেলেছি এটা তো তখন বুঝেছি যখন বুঝলাম দূর থেকেও ওকে দেখার সম্ভাবনা আর নেই, আর সত্যি বলতে আমি শুধু ওই একটা বিষয়ের কারনেই হৃদয়টা ছিন্ন হয়েছে সেটা নয়.... আমার সব ভালোলাগার জিনিসগুলো অতীতেই তো ছিল...!

স্কুলের বন্ধুগুলো— ইচ্ছা হয় যাদের সাথে আবারো একবার এক জায়গায় বসে খাতায় দাগ কেটে 'চোর পুলিশ' খেলতে। রঙিন স্বপ্নগুলো—যেগুলো ভাবতাম একদিন ঠিক পূরণ করাবো...!! স্কুল—যেটাতে আমার সব 'আশা' 'ভালবাসা' 'বন্ধুত্ব' 'খুশি' এই জায়গাটাতেই ছিল.... যেখানে স্বপ্ন বুনেছিলাম, যেখানে ভালবাসার মানুষ পেয়েছিলাম, যেখানে নিজের ভাইয়ের মত বন্ধুরা ছিল....!!

সবকিছু আজ অতীতের পাতায় দাগ কেটেছে....! সবকিছু হারিয়েছি। এখন আর অবশিষ্ট কিছুই নেই। আজ আর নতুন করে আর স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে হয় না, নতুন করে আর বন্ধুত্বের মধ্যে ভরসা পাই না। চেহারার মাঝে হাসি আছে মানে এটা বোঝায় না' যে আমি খুশি আছি।

সবানা : আচ্ছা মামা.... তুমি ওই মেয়েটাকে কখনো নিজের মনের কথা জানাও নি....

আমি :'না সে সাহস আর কখনো হয়ে ওঠেনি.... এবং তার বিয়ে হয়ে গেছে....! এবং স্কুলের বন্ধুগুলো নিজের গন্তব্যস্থানে চলে গেছে। যেভাবে মানুষ জন্মানোর পর একদিন চিরতরে এই সংসারের মায়া ছেড়ে চলে যায়, এবং আর কখনো দেখা হয় না...! ঠিক সেভাবেই তারাও নিজের মতন নিজের জায়গায় চলে গেছে....! রঙিন স্বপ্নগুলোও ছুটি নিয়েছে....! সেই পুরনো আশাগুলো অন্তরের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে....! কিন্তু আমরা এভাবে তো আর নিজেকে শেষ করে ফেলতে পারিনা। এক পর্যায়ে এসে বুঝলাম অতীতের অনুভূতি'গুলি শুধু হতাশা আর নিরাশা ছাড়া জীবনে কিছুই দেয় না। আবার ঘুম থেকে উঠতে হবে নতুন সূর্য দেখার অপেক্ষায়, সেভাবে নিজেকেও নতুন করে গড়তে হবে। জীবন আছে তো বেঁচে থাকার নতুন দিশা খুঁজতে হবে।

অতীতের ভাবনা চিন্তা থেকে শিখেছি, বর্তমানকে কদর করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে গিয়ে পুরনো অতীতটা নিয়ে আফসোস না করতে হয়....!!

এই আশাটুকু নিয়েই নতুন সকালের—সাবেরা দেখার অপেক্ষায় থাকি।

সবানা : —হুম....বুঝতে পেরেছি....।

'তারপর দেখি ওর চেহারায় হালকা স্বস্তির অনুভব দেখতে পেলাম, হালকা মৃদু হাসি ফুটেছে....! আর সৃষ্টিকর্তার কাছে কাছে দোয়া চাই এভাবেই ওর হাসি কায়েম থাকুক। তারপর বাস 'দেউলী' চলে আসল, ওকে নামিয়ে দিয়ে সামনের গন্তব্যে পাড়ি দিলাম....! ও একটা হাসি মুখ নিয়ে চলে গেল....!

বাংলার উৎসব

কারিনা সেখ
সেমিস্টার - ৪, বাংলা বিভাগ, রোল - ২২২৫২৪-১১-০০০৯

ভূমিকা : বাংলার সমাজ জীবনে উৎসব প্রিয়তার প্রাধান্যকে মাথায় রেখে লোককথায় প্রচলিত হয়েছে ''বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন''। উৎসবের দিনগুলোতে সকলে একজোট হয়ে আনন্দে ও হয় ভাবের আদান প্রদান। তবে প্রত্যেক উৎসব হয়তো সব জায়গাতে একই সমরোহে পালন করা হয় না। থাকে গুরুত্বভেদে তারতাম্য।

উৎসবের লক্ষ্য কী : সামাজিক পারিবারিক স্তরে; জাতীয় স্তরে, ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে ও ঋতু ভেদে বিশেষ দিনগুলোতে আনন্দ সহকারে সে অনুষ্ঠানগুলি পালন করা হয় তাকে বলে উৎসব। একঘেয়েমি জীবনযাপনের ফলে মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন মানুষের এই ক্লান্তি তথা পারিশ্রমিক কষ্টকে দূর করার অমৃত ঔষধ্য হিসেবে উৎসব। প্রাত্যাহিক দিনের রুটিন থেকে বেরিয়ে সকলে খুশিতে মেতে ওঠে। উৎসব তাই মানসিক বিষন্নতার অবসান ঘটিয়ে আমাদের জীবনে নতুন কর্মশক্তির বিকাশ ঘটায়।

আনন্দ ও উৎসব : উৎসব কথার অর্থ হল যা আমাদের আনন্দ প্রদান করবে। তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে এর অর্থ বদল ঘটেছে। প্রাচীনকালে কৃষি জীবনযাপন করার পূর্বে মানুষ যখন পশু শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ করতো তখনো তারা দিনশেষে সকলে এক সাথে গুহার পাশে আগুন জ্বালিয়ে নাচ-গানের দ্বারা বিনোদন আয়োজন করত।

উৎসবের শ্রেণীকরণ : বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ কথাটির অর্থ বাঙালির বাস্তব জীবনের সাথে খুবই মিল। বাঙালির জীবনযাপনের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো উৎসব। যা ছাড়া বাঙালির জীবন অসম্পূর্ণ।

তবে বাঙালির উৎসবে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক সময়ে এই উৎসবকে একাধিক শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে যথা-

১) ধর্মীয় উৎসব
২) ঋতু উৎসব
৩) জাতীয় উৎসব
৪) লোক উৎসব
৫) সামাজিক পারিবারিক উৎসব

১) ধর্মীয় উৎসব : বাংলা একাধিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মিলিত বাসস্থানে বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ধর্মকে কেন্দ্র করে একাধিক উৎসবের আয়োজন হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে একে অপরের উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠে।

২) ঋতু উৎসব : বছরের ছয়টি ঋতুকে কেন্দ্র করে বাঙালির অসংখ্য উৎসব। নাচ, গানসহ নানান সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উৎঘাটিত হয় শারদোৎসব, বসন্ত উৎসব এমনকি বর্ষা। এছাড়া বসন্তে দোল উৎসব, পৌষে মকর, অগ্রহায়ণ নবান্ন ইত্যাদি।

৩) জাতীয় উৎসব : সব ভারতীয় জাতীয় উৎসব গলিতেও বাংলার বাঙালির আনন্দে ঘাটতি থাকে না। শহর থেকে গ্রাম্য সারা বাংলা মেতে ওঠে জাতীয় উৎসবগুলিতে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১৫ই আগস্ট ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস ও সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়।

৪) লোক উৎসব : লোক উৎসব হল বাঙালির উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই লোকউৎসবে সকলে মিলিতে হয়ে আনন্দের সাথে মেতে ওঠে। কিছু লোক উৎসবের উদাহরণ হল টুসু, ভাদু, চড়ক, দোল, ইতু ইত্যাদি লোক উৎসবের অন্তর্গত।

৫) সামাজিক পারিবারিক উৎসব : পারিবারিক উৎসব গুলির মাধ্যমে সপরিবারের মদ্যে একত্রিত হওয়ার সুযোগ গড়ে ওঠে এবং অপরের দুঃখ অথবা আনন্দের অনুভূতিগুলি ভাগ করে নেয়।

৬) উৎসবের সেকাল ও একাল : সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে উৎসবে আয়োজনের রূপের পরিবর্তন ঘটেছে ব্যাপক। সেকালের উৎসবে ছিল প্রাণের স্পর্শ তা পরিবারগত ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক গত যাই হোক না কেন এখনকার রাজবাড়ি জমিদার গ্রামের নাট্য মন্দিরগুলোতে উৎসব শুরু হওয়ার একমাস পূর্বে উৎসবের আয়োজন শুরু হতো। উৎসবের মিলন ধারায় গরিব জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে একসাথে আনন্দে মেতে ওঠতো।

একালের উৎসবে বহু আধুনিকিকরণ ঘটেছে। আধুনিক উৎসবের বিশেষ কিছু আর্কষণ হল- বৈদ্যুতিক নাগরদোলা, এরোপ্লেন, চিড়িয়াখানা, সিনেমা প্রদর্শনী, পুষ্প প্রদর্শনী ইত্যাদি।